১৯৫৬

মানভূম থেকে পুরুলিয়া

গৌতম দে

পুনশ্চ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

শুভেচ্ছা

'১৯৫৬-মানভূমি থেকে পুরুলিয়া' — শীর্ষক একটি বই লিখেছেন গৌতম দে। লেখক বাঁকুড়া জেলার গণ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। বইটির পান্ডুলিপি হাতে পেলেও শারীরিক কারণে এখনও পড়ে উঠতে পারি নি। কিন্তু বইটির লেখক ও সংকলক গৌতম দে'র কাছ থেকে জেনেছি তিনি এই বইয়ে পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির আন্দোলনের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া এই বইয়ে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া স্বাধীনোত্তর ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমি জেনেছি এ সম্পর্কিত নানা দলিল এতে আছে এবং এ বিষয়ে তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যও বইটিতে সংযোজিত হয়েছে।

আমি আশা করি বইটি আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হবে।

জ্যোতি বসু

(জ্যোতি বসু)

কৃতজ্ঞতা

এই গ্রন্থ প্রস্তুত করার ব্যাপারে নানাজনের কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। অনেকগুলি দুর্লভ ইস্তাহার ফটোগ্রাফ ও পুস্তিকা, যা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কি তারও বেশী যিনি বুকে আগলে রেখেছিলেন এবং এই গবেষণার কাজে অকৃপণভাবে আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন তিনি আমার ছোটমামা পুরুলিয়া নিবাসী পুরাতাত্ত্বিক ও ইতিহাস গবেষক শ্রীঅনিল কুমার চৌধুরী। তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এই কাজের সূচনার সময়ে লোকসেবক সংঘের পরিচালক পুরুলিয়ার প্রবাদপুরুষ অরুণ ঘোষ জীবিত ছিলেন, জীবিত ছিলেন লাবণ্যপ্রভা ঘোষ। তাঁরা তাঁদের সযত্নে রক্ষিত আঞ্চলিক ইতিহাসের অমূল্য দলিল 'মুক্তি' পত্রিকার আলোচ্য সময়ের সংখ্যাগুলি দেখার ও কপি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। লোকসেবক সংঘের পুরুলিয়া শহরের তেলকল পাড়া শিল্পাশ্রমের আবাসিক অরুণ ঘোষের শেষ জীবনের ছায়াসঙ্গী শ্রীভাস্কর চ্যাটার্জী ও লোকসেবক সংঘের সম্পাদক শ্রীমুক্তি মাহাত পত্রিকাগুলি ব্যবহার করার জন্য বের করে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁদেরও। এর অনেকগুলি দলিল ইংরাজী ও হিন্দী থেকে অনুবাদ করতে হয়েছে। যারা অনুবাদ করার দীর্ঘ ক্লেশ নিয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীদেবব্রত চৌধুরী, অধ্যাপক বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বৈরাগী, রীতা ব্যানার্জী, স্বপ্না দাস। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরণীগুলি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন বিধানসভার প্রাক্তন উপসচিব শ্রীভাগবত দত্ত। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত পুরাতন স্থানীয় সংবাদপত্রের কপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীকালিপদ সেনগুপ্ত মহাশয়। সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন শ্রীসৌমিত্র সেনগুপ্ত, *ডবলিউ.বি.সি.এস.*। এঁদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। 'পুনশ্চ'র সত্ত্বাধিকারী শ্রী সন্দীপ নায়েক গবেষণা গ্রন্থটিকে মুক্তির আলো দিয়ে এবং শিশু সাহিত্যিক ও সম্পাদক শ্রী তাপস মুখোপাধ্যায় প্রকাশনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রবীণ আলোকচিত্র শ্রী মলয় ঘোষ কিছু দুর্লভ ফটোগ্রাফ দিয়েছেন। তাঁকেও জানাই অসীম কৃতজ্ঞতা।

গভীর অভিনিবেশ সহকারে অসীম ধৈর্য্য নিয়ে প্রুফ দেখে দিয়েছেন, সহধর্মিণী অধ্যাপিকা সুমিত্রা দে। শ্রীঅমিত ব্যানার্জী অসীম মনঃসংযোগের সঙ্গে ডিটিপি কাজটি করেছেন। সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধের অন্ত নেই। যদি কোনদিন এর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়, যার মালমশলা এখনও অনেক জমে আছে, তখন এদের সকলের সহযোগিতা প্রার্থী হয়ে থাকলাম।

গৌতম দে

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ

মানভূমের মর্মকথা ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

লোকসেবক সংঘের তত্ত্বগত সূত্রপাত ৯৩

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

মানভূমের বাংলাভাষী ও তার জীবনচর্যা
প্রসঙ্গে লোকসেবক সংঘ ১০৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

কমিশনকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
স্মারকপত্র ও পার্টির অবস্থান ১৭৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও তার প্রতিবেদন ১৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রসঙ্গে ভারতের
কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিটি
ও জেলা কমিটিগুলির প্রস্তাব ২১৩

সপ্তম অধ্যায় ঃ

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বক্তৃতা সমূহ ২৩৯

অষ্টম অধ্যায় ঃ

ভূখণ্ডের প্রশ্নে চাপান উতোর ৩১৫

নবম অধ্যায় ঃ

সংযুক্তির আচমকা প্রস্তাব ও সংঘাতের উপক্রমণিকা ৩৩১

দশম অধ্যায় ঃ

মুক্তির পাতা থেকে ৩৭৫

একাদশ অধ্যায় ঃ

অতুল চন্দ্র ঘোষ ও নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত ৪৬৭

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ

সংবাদপত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনের বিবরণ ৪৭৯

প্রথম অধ্যায়

মানভূমের মর্মকথা

বাংলাভাষার সরকারী স্বীকৃতির আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিযুক্ত হওয়ার পর মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির দাবীর আন্দোলন বুঝতে হলে তৎকালীন মানভূম জেলার প্রকৃত পরিচয় জানা দরকার। জানা দরকার তার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, তার প্রকৃতি পরিচয়, জনগোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিন্যাস-পুনর্বিন্যাসের ইতিহাস ও সমাজতত্ব। এ বিষয়ে প্রাথমিক পরিচয় দেবার জন্য কয়েকটি বই-এর এবং পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক রচনার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। কোনো জেলার এ ধরণের বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে সাধারণত বৃটিশ আমলের কর্তাব্যক্তির তৈরী রিপোর্ট পাতার পর পাতা উদ্ধৃত করতে হয়। এক্ষেত্রে তা করতে হয়নি। স্থানীয় ইতিহাসের আকর যুগিয়ে দিয়েছেন তৎকালীন মানভূম জেলার স্থানীয় নগ্নপদ গবেষকরা। যে চারজনের লেখা উদ্ধৃত হয়েছে তাঁরা সকলেই স্থানীয়। তাঁদের লেখার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য আছে। ভাষার তারতম্য আছে। সময়কালের তারতম্য আছে। কিন্তু এদের লেখায় ইতিহাসের মৃত্তিজ গন্ধ আছে এবং যে আকর আছে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তা অতীব দুর্লভ উপাদান। অন্য জেলার ক্ষেত্রে অনুরূপ আকর আছে কিনা জানা নেই। সেই কারণে কোনো মন্তব্য ছাড়াই লেখাগুলি যেমনভাবে তৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল তা তুলে দেওয়া হল। এই ইতিহাসকারগণ অপ্রাতিষ্ঠানিক হলেও মানভূমের সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে এঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

মানভূমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

বাঙ্গলা "মান" অর্থে সম্মান এবং "ভূম" অর্থে স্থান এই শব্দদ্বয়ের সংযোগে সম্মানসূচক মানভূম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন অনার্য্যদের সময়ে এই স্থানে "মল্ল" অর্থাৎ যোদ্ধাদের বাসস্থান ছিল। সেইজন্য এই স্থান মল্লভূম বা মলভূম নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা মানভূম নামে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে মল্লভূমের অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইংরাজী ১৮৩৩-১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মানভূম জেলা বর্তমান আকারে গঠিত হয়, পূর্বে ইহা বঙ্গ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সন ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে ইহাকে বঙ্গ প্রেসিডেন্সি হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাস ঃ

অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে মুণ্ডা, ভূমিজ, সাঁওতাল ও কোল প্রভৃতিজাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বিহার প্রদেশস্থ এই অঞ্চলটি বন জঙ্গল ও পর্ব্বতাদির দ্বারা সমাকীর্ণ থাকায় এখানে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা অতি অল্প পরিমাণে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল; এই কারণবশতঃ ভূমিজ ও কোল প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ নির্বিঘ্নে রাজ্য বিস্তারপূর্ব্বক সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউএন সাং কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধদের সময়ে এইস্থানে "কাহালোনা সোফালনা" অর্থাৎ কিরণ সুবর্ণ নামক একজন ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহারই নামানুসারে এখানকার প্রধান নদী সুবর্ণরেখার নামকরণ হইয়াছে। শুনা যায় এই নদীর বালুকা মধ্যে সুবর্ণের কণা পাওয়া যায় তজ্জন্য এই নদী সুবর্ণরেখা আখ্যায় অভিহিতহইয়াছে।

পাতকুম পরগণার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদী তীরে দুলমী নামক স্থানের সন্নিকটে কিরণ সুবর্ণের রাজধানী ছিল। 'বাংলার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই কিরণ সুবর্ণ বা কর্ণ সুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান রাঙ্গামাটি, তাঁহার মতে কিরণ সুবর্ণ বা কর্ণ সুবর্ণ রাজার নাম নহে স্থানের নাম। তাঁহার রাজত্বকালে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হইয়াছিল, তৎপরে অনেকস্থানে জৈনধর্মের বিস্তৃতি লাভের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈনদিগের আধিপত্য সময়ে মানবাজার, বরাবাজার ও দুলমী প্রভৃতি স্থানগুলি বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই সমস্ত স্থান হইতে তৎকালে পাটনা (পাটলিপুত্র), গয়া, কাশী, তমলুক (তাম্রলিপ্ত), বিষ্ণুপুর

প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে যাতায়াতের অনেকগুলি রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই সমস্ত রাস্তা কোনও কোনও স্থানে কালের গতিতে ভগ্নাকারে অব্যবহার্য্য হইয়া অতীত সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। এই সময়ে আর্য্য সন্তানগণ স্থানে স্থানে পূর্ব্বোক্ত ভূমিজ, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের সমাজে শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক একসঙ্গে পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ভূমিজগণ কতিপয় শতাব্দী পরে পুনরায় আর্য্যদিগের সহবাসে বল ও বুদ্ধি অর্জন করতঃ অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠেন। তাঁহারা শান্তিপ্রিয় আর্য্যদিগের প্রভুত্ব নষ্ট করিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মুণ্ডা —

এক্ষণে আমরা দেখিব কি প্রকারে মুণ্ডা, কুড়মি ও সাঁওতালগণ এই জেলাতে আসিয়াছিল।

একসময়ে মুণ্ডাগণ মগধে বাস করিত, আজ পর্যন্ত ইহাদের প্রাধান্য ঐ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগয়ার ভাস্কর মূর্ত্তিগুলি কোল ভাবাপন্ন। ক্যাপ্টেন ম্যালনী সাহেবের মতে বুদ্ধদেবের জন্মকালে মগধে লিখন প্রণালী ছিলনা। অদ্যাপি মুণ্ডা ভাষার কোন অক্ষর নাই। ইদানীং শিক্ষিত মুণ্ডাগণের মধ্যে অনেকে হিন্দি এবং কেহ বা ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করেন। উচ্চশ্রেণীর চেরো সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের মত গ্রহণ করিয়াছিল এবং আর্য্য ভাবাপন্ন হইয়াছিল, নিম্ন সম্প্রদায় ঐ মত অগ্রাহ্য করিয়াছিল। বুচানন সাহেবের মতে চেরো ও কোল একই জাতি। ইহারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া পবিত্র হিন্দু বলিয়া পরিচিত হয়। মহাত্মা ডালটন সাহেব বলেন যে এই কোল জাতি প্রথমে গঙ্গার উপত্যকাসমূহে বাস করে এবং কিছুকাল এই স্থানে বসবাসের পর অনেকটা সভ্যতা অর্জন করে।

বর্তমান সময়ে সমস্ত বিহার প্রদেশে কোল রাজ্যের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোটনাগপুরের অধিত্যকাসমূহে মুণ্ডাগণের বাসস্থান, ইহাদের বাসের প্রথমাবস্থায় এই দেশ জঙ্গলপূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য পরাজিত আদিম জাতি বিভিন্ন স্থান হইতে পলাইয়া আসিয়া এই নিরাপদ স্থানে বাস করে এবং শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই উচ্চ এবং উত্তমভাবে রক্ষিত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মুণ্ডাগণ বলে যখন তাহারা ছোটনাগপুরের প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল তখন তাহাদের কোন রাজা ছিলনা। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্য গঠন করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই একজন করিয়া মুণ্ডা বা প্রধান থাকিত। সংস্কৃত ভাষায় মুণ্ডা শব্দের অর্থ প্রধান। যে গ্রামে ইহারা বাস করিত তাহাদের বংশধরগণ মুণ্ডা নামে অভিহিত হইত। এই কারণবশতঃ ঐ জাতি মুণ্ডা নাম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা আপনাদিগকে কঙ্কপাঠ মুণ্ডা নামে অভিহিত করে। মানভূম জেলাতে মুণ্ডা শব্দটি মুড়া নামে পরিণত হইয়াছে। ইহাও সংস্কৃত শব্দ। এক সময়ে মুণ্ডারি ভাষা সমগ্র বিহার ও বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত ছিল। কোলগণ তাহাদের প্রধানকে মুণ্ডা সাঁওতালগণ মাঝি এবং ভূমিজগণ সর্দ্দার বলিয়া অভিহিত করে।

পুরাতন মুণ্ডা গ্রামে এখনও পর্যন্ত যে শৃঙ্খলা, রীতি, নীতি ও আচার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

কুড়মি —

সম্ভবতঃ কুড়মিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গলার আর্য্য উপনিবেশের আদিম অধিবাসী। ইহাদের অনেক পুরাতন দ্রব্য গভীর জঙ্গলে লুক্কায়িত আছে; এবং পুরাকালের সভ্যতা এই আদিমজাতির কুঠীর হইতে উত্থিত হইয়াছে।

বুচানন সাহেব প্রণীত গোরক্ষপুর বিবরণে কুড়মিদিগকে শূদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটি কুড়মি জমিদার আসাফ্‌উদ্দৌলা কর্ত্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন কিন্তু তাহাতে তৎদ্দেশীয় রাজপুত রাজগণ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তিনি ঐ উপাধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। লাঙ্গলধরা কুড়মি সম্প্রদায় মধ্যে বড়ই লজ্জাকর ও দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কারণে কুড়মি বংশ উচ্চ বংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। দক্ষিণ ভারতে ইহারা কুম্‌নি বা কুম্বী নামে পরিচিত। ক্যাম্বেল সাহেব ভারতবর্ষের এথ্‌নলজি নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যস্থলে ও পূর্ব্বাংশে অনেক কুড়মি দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল স্থানে ইহারা পরিশ্রমী কৃষক বলিয়া খ্যাত। নিম্ন দোয়াব হইতে জব্বলপুর ও সাগর রাজ্য পর্য্যন্ত নর্মদা নদের উভয় পার্শ্বে ও মালওয়াতে এই কুড়মি জাতির বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। পশ্চিম গুজরাটে এবং সমস্ত মারাট্টা প্রদেশে ইহারা চাষ আবাদ করিবার জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের অপরাপর জাতি অপেক্ষা ইহারা সংখ্যায় অধিক।

কুড়মিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল পূর্বে ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানিত ছিল এবং মানভূমের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত। কোল অধিবাসীদের সহিত ইহাদের বিবাদের কথাও জনশ্রুতি আছে।

অধুনা কুড়মিগণের অনেক বাসস্থানে কতকগুলি বৃহৎ প্রস্তর স্তম্ভ দেখিয়া অনুমিত হয় যে এককালে এই সকল স্থান ভূমিজ বা মুণ্ডা দ্বারা অধিকৃত ছিল। মহাত্মা ডালটন সাহেব অনেক সম্ভ্রান্ত বংশ এই কুড়মি বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সিন্ধীয়া এবং প্রসিদ্ধ ভনসোলা বংশ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যপ্রদেশে ইহারা ঝাড়ি কুড়মি বা জঙ্গলের কুম্বী নামে খ্যাত। সর্বপ্রথমে ইহারাই জঙ্গল পরিস্কার করিয়া সেই স্থানে বাস করেন। বেরার ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে আগত কুম্বীগণ মারাটা দেশী প্রথম রঘুজীর শিষ্য।

কুড়মিগণ উচ্চ বংশসম্ভূত হইলেও বাঙ্গলাদেশে ইহারা জলাচরণীয় জাতি মধ্যে গণ্য হয়না। বিহার প্রদেশে ইহার জল শুচি জাতি।

সাঁওতাল —

ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংহভূম, ময়ূরভঞ্জ এবং বালেশ্বর জেলাতে অনেক সাঁওতাল বাস করে। তন্মধ্যে

সাঁওতাল পরগণাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়; কিন্তু ঐ স্থান সাঁওতালগণের আদিম বাসস্থান নহে।

দামোদর নদের উভয়পার্শ্বে, কংসাবতী ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে ইহাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। দামোদর নদকে ইহারা অতি পবিত্র নদ বলিয়া জ্ঞান করে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শীলদা পরগণা ইহাদের আদি বাসস্থান বলিয়া কথিত হয়। শীলদা পরগণাই সামন্তভূমি বলিয়া খ্যাত। কেহ কেহ বলেন ইহা হইতেই সাঁওন্ত বা সাঁওতাল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

বাঘরায়ের বিবৃতি অনুসারে আমরা জানিতে পারি যে সাঁওতালগণ পূর্বে খারওয়ার বলিয়া পরিচিত হইত এবং মানভূম জেলার পূর্বাংশে তাহারা অনেক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

মুসলমান আধিপত্য —

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সমস্ত ছোটনাগপুর প্রদেশটিকে "ঝাড়খণ্ড" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, আকবরনামাতে ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০৫ সালের অষ্টাদশ ধারানুসারে বর্তমান মানভূম, সিংহভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হাজারিবাগের কিয়দংশ লইয়া জঙ্গলমহল নামে একটি স্বতন্ত্র জেলার সৃষ্টি হয়। তৎপূর্বে ঐ সকল ভূভাগকে সরকারী কাগজপত্রে ঝাড়খণ্ড নামে উল্লেখ করা হইত।

এই ঝাড়খণ্ডই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদরেণু সংস্পর্শে পবিত্র ও মহিমান্বিত হইয়াছিল।

এই প্রদেশস্থ অসভ্য বর্বর জাতি সমূহকে শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত মুসলমান নরপতিগণ বিশেষরূপে সামরিক আয়োজন করিয়া রাখিতেন, কারণ অসভ্য জাতিগণ মধ্যে মধ্যে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত যে তন্নিমিত্ত এই দেশস্থ শাসন কর্ত্তৃগণ বিপন্ন হইয়া পড়িতেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান শাসন সময়ে বরাহভূমি, সামন্তভূমি ও মানভূমি নামক ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি ভীষণ অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। এক সময়ে অজেয় রাজপুত জাতি এই স্থানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন পঞ্চকোট রাজগণ পঞ্চকোট পাহাড়ের নিকটস্থ প্রদেশটিকে ইহার স্বাভাবিক উচ্চতা বশতঃ "শিখরভূম" নামে অভিহিত করেন। এখন পর্যন্ত তাহাদের বংশধরগণ এই প্রদেশের ঐ আখ্যাই দিয়া আসিতেছেন।

বৃটিশ আধিপত্য —

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজের বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা দেওয়ানী প্রাপ্তি সময়ে মানভূম জেলার বিস্তৃত ভূখণ্ড বৃটিশ শাসনাধীনে আসিয়াছিল। তৎকালে এই প্রদেশকে সাধারণে পঞ্চকোট রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিত। এই প্রদেশের কোন কোন অংশ শাসনাধীন করিতে ইংরাজ সরকারকে সামান্য সামরিক আয়োজন করিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুরের জঙ্গল মহলের অন্তর্গত মানভূম ও বরাভূমের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের রাজপ্রতিনিধি গ্রেহাম সাহেবের আদেশানুসারে লেফটান্যাণ্ট ফার্গুসন কর্ত্তৃক এক সামরিক